

উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন

কাজী নজরুল ইসলাম

[লেখক-পরিচিতি : কাজী নজরুল ইসলাম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সালে (২৪শে মে ১৮৯৯) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমান ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এজন্য তাঁকে ‘বিদ্রোহী কবি’ বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, প্রলয়শিখা, চক্রবাক, সিদ্ধহিন্দোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা ইত্যাদি তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস। যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সালে কবি ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে (বর্তমান নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।]

‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।’

— রবীন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নতুন করিয়া মহাজাগরণের দিনে আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না— যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সে হইতেছে, আমাদের দেশের তথাকথিত ‘ছোটলোক’ সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণির লোকের অন্তর যদি দেখিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত ‘ছোটলোক’-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, এই ‘ছোটলোক’ এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারী জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোটো মনে করে, সঙ্কোচ জড়িত তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও—যে আমাদেরই মতো মানুষ— সেও যে সেই এক আল্লাহ্—এর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে,— তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে— আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন। তাই আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত

হইতে পারিতেছে না। হইবে কীরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে-দেশকে, সে-জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অটালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমরা ভদ্রসম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাইতে পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝো। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারো, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হইবে না, একবার মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবিয়া দেখো দেখি! তিনি ভারতে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন!

তিনি যদি এমনি করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ-দুঃখের এমনি করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইল না বলিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপবাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটি ইঙ্গিতে এমনি করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? তাঁহার অভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহঙ্কার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই 'ছোটলোক'কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন,—সে-আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই,—সে যে ডাকার মতো ডাকা,—তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাঁহার দিকে এত হা হা করিয়া ব্যগ্র বাহু মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনো এমনি করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করেন নাই! এ মহা-আহ্বানে কি তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পারো, এমনি করিয়া ডাকো, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন করো—দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি,—ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুক করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চশিরে তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এস, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ বোধন-বাঁশিতে সুর দিই—

‘কীসের দুঃখ, কীসের দৈন্য,
কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ!’ □

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা : চণ্ডাল- চাড়াল, হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের লোক। বোধন-বাঁশি- বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশি। দৈন্য- দারিদ্র্য, দীনতা।

পাঠ-পরিচিতি : ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন’ শীর্ষক প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলি (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড) থেকে সংকলন করা হয়েছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পটভূমিতে লেখা প্রবন্ধটি সম্পাদনা করে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এটি কাজী নজরুল ইসলামের যুগবাণী নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থের একটি রচনা। আলোচ্য প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। একটি দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ দূর করা আবশ্যিক। বিশ্বের বুকে মর্যাদাবান জাতি ও রাষ্ট্র গঠন করতে প্রতিটি দেশের মনীষীগণ আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁদের নির্দেশিত পথে যদি আমরা পরিভ্রমণ করতে পারি তবে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। প্রবন্ধটিতে জাতি, ধর্ম, সমাজভেদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এ প্রবন্ধ শ্রেণি, ধর্ম, জাতি ও সমাজভেদমুক্ত বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

- ১। মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কী কী করা উচিত, তা লেখ।
- ২। বাংলাদেশে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার প্রস্তাবনাগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। আজ আমাদের মহাজাগরণের দিনে কত আনা শক্তি উপেক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করছে?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. ছয় আনা | খ. আট আনা |
| গ. দশ আনা | ঘ. বারো আনা |

- ২। আজ আমাদের এত অধঃপতনের কারণ কী?

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ক. মেহনতি মানুষদের প্রতি অবহেলা | খ. গণজাগরণের অভাব |
| গ. স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ | ঘ. ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।’

৩। ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের কোন মানসিকতার পরিচয় উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে?

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ক. অসাম্প্রদায়িকতার | খ. সত্যবাদিতার |
| গ. ভ্রাতৃত্ববোধের | ঘ. সাম্যবাদিতার |

সৃজনশীল প্রশ্ন

‘তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তরাই মানুষ, তরাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!’

- ক. ব্যক্তির সমষ্টিকে এক কথায় কী বলা যায়?
- খ. আমাদের দেশে জনশক্তি গঠন হতে পারছে না কেন?
- গ. উদ্দীপকের ‘মজুর, মুটে ও কুলি’ ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন’ প্রবন্ধের কাদের সমর্থক? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকের মূলভাব ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন’ প্রবন্ধের খণ্ডাংশ মাত্র।” — মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।